আত তাগাবুন

৬৪

নামকরণ

সূরার ৯নং আয়াতের ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ কথাটির التَّغَابُنِ শব্দটিকে নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটি সেই সূরা যার মধ্যে التَّغَابُنِ শব্দটি আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুকাতিল এবং কালবী বলেন, সূরাটির কিছু অংশ মক্কায় এবং কিছু অংশ মদীনায় অবতীর্ণ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আতা ইবনে ইয়াসির বলেন ঃ প্রথম থেকে ১৩ আয়াত পর্যন্ত মক্কায় অবতীর্ণ এবং ১৪ আয়াত থেকে শেষ পর্যন্ত মদীনায় অবতীর্ণ। কিন্তু অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে সম্পূর্ণ সূরাটি মদীনায় অবতীর্ণ। যদিও সূরার মধ্যে এমন কোন ইশারা-ইংগিত পাওয়া যায় না যার ভিত্তিতে এর নাযিল হওয়ার সময়-কাল নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। তবে এর বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলে অনুমিত হয় যে, সম্ভবত সূরাটি মাদানী যুগের প্রথমদিকে নাযিল হয়ে থাকবে। এ কারণে সূরাটিতে কিছুটা মক্কী সূরার বৈশিষ্ট এবং কিছুটা মাদানী সূরার বৈশিষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান ও আনুগত্যের দাওয়াত এবং উত্তম নৈতিক চরিত্রের শিক্ষা দেয়া। বক্তব্যের ধারাক্রম হচ্ছে ঃ প্রথম চার আয়াতে গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। ৫ থেকে ১০ আয়াতে যারা কুরআনের দাওয়াত মানে না তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে এবং যারা কুরআনের এ দাওয়াতকে মেনে নিয়েছে ১১ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত আয়াতগুলোতে তাদেরকে সম্বোধন করে কথা বলা হয়েছে। কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্য দ্বারা গোটা মানব জাতিকে সম্বোধন করে চারটি মূল সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। প্রথমত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহান যেখানে তোমরা বসবাস করছো তা আল্লাহহীন নয়। বরং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এমন এক আল্লাহ এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক যিনি যে কোন বিচারে পূর্ণাঙ্গ এবং দোষত্রুটি ও কলুষ-কালিমাহীন। এ বিশ্ব-জাহানের সবকিছুই তাঁর সে পূর্ণতা, দোষ-ত্রুটিহীনতা এবং কলুষ-কালিমাহীনতার সাক্ষ দিচ্ছে।

দ্বিতীয়ত বলা হয়েছে, এই বিশ্ব-জাহানকে উদ্দেশ্যহীন ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। এর সৃষ্টিকর্তা একে সরাসরি সত্য, ন্যায় ও যুক্তির ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। এখানে

এরূপ ভ্রান্ত ধারণায় লিপ্ত থেকো না যে, এই বিশ্ব-জাহান অর্থহীন এক তামাশা, উদ্দেশ্যহীনভাবে এর সূচনা হয়েছে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে তা শেষ হয়ে যাবে।

তৃতীয়ত বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সর্বোত্তম আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং কুফর ও ঈমান গ্রহণ করা বা না করার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। এটা কোন নিষ্ফল ও অর্থহীন ব্যাপার নয় যে, তোমরা কুফরী অবলম্বন করো আর ঈমান অবলম্বন করো কোন অবস্থাতেই এর কোন ফলাফল প্রকাশ পাবে না। তোমরা তোমাদের এই ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে কিভাবে কাজে লাগাও আল্লাহ তা দেখছেন।

চতুর্থত বলা হয়েছে, তোমরা দায়িত্বহীন নও বা জবাবদিহির দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত নও। শেষ পর্যন্ত তোমাদেরকে তোমাদের স্রষ্টার কাছে ফিরে যেতে হবে এবং সেই সত্তার সম্মুখীন হতে হবে যিনি বিশ্ব-জাহানের সবকিছু সম্পর্কেই অবহিত। তোমাদের কোন কথাই তাঁর কাছে গোপন নয়, মনের গহনে লুক্কায়িত ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত তাঁর কাছে সমুজ্জল ও সুস্পষ্ট।

বিশ্ব-জাহান এবং মানুষের প্রকৃত অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে এই চারটি মৌলিক কথা বর্ণনা করার পর বক্তব্যের মোড় সেই সব লোকদের প্রতি ঘুরে গিয়েছে যারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। ইতিহাসের সেই দৃশ্যপটের প্রতি তাদের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যা মানব ইতিহাসে একের পর এক দেখা যায়। অর্থাৎ এক জাতির পতনের পর আরেক জাতির উত্থান ঘটে এবং অবশেষে সে জাতিও ধ্বংস হয়ে যায়। মানুষ তার বিবেক-বুদ্ধির মাপকাঠিতে ইতিহাসের এ দৃশ্যপটের হাজারো কারণ উল্লেখ করে আসছে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এর পেছনে কার্যকর প্রকৃত সত্য তুলে ধরেছেন। তা হচ্ছে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মৌলিক কারণ শুধু দু'টিঃ

একটি কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাদের হিদায়াতের জন্য যেসব রসূল পাঠিয়েছিলেন তারা তাঁদের কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। ফল হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে তাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিয়েছেন। ফলে তারা নানা রকম দার্শনিক তত্ত্ব রচনা করে একটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তি থেকে আরেকটি গোমরাহী ও বিভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছে।

দুই ঃ তারা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার ব্যাপারটিও প্রত্যাখ্যান করেছে এবং নিজেদের ধ্যান-ধারণা অনুসারে মনে করে নিয়েছে যে, এই দুনিয়ার জীবনই সবকিছু। এ জীবন ছাড়া এমন আর কোন জীবন নেই যেখানে আল্লাহর সামনে আমাদের সব কাজের জবাবদিহি করতে হবে। এই ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস তাদের জীবনের সমস্ত আচার-আচরণকে বিকৃত করে দিয়েছে। তাদের নৈতিক চরিত্র, কর্মের কলুষতা ও নোংরামি এতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আযাব এসে তাদের অস্তিত্ব থেকে দুনিয়াকে পবিত্র ও ক্লেদমুক্ত করেছে। মানব ইতিহাসের এ দুটি শিক্ষামূলক বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে ন্যায় ও সত্য অস্বীকারকারীদের আহবান জানানো হচ্ছে যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। আর তারা যদি অতীত জাতিসমূহের অনুরূপ পরিণামের সম্মুখীন হতে না চায় তাহলে আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং কুরআন মজীদ আকারে হিদায়াতের যে আলোকবর্তিকা আল্লাহ দিয়েছেন তার প্রতি যেন ঈমান আনে। সাথে সাথে তাদেরকে এ বিষয়ে সাবধান

করা হয়েছে যে, সেদিন অবশ্যই আসবে যখন আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একত্র করা হবে এবং তোমাদের প্রত্যেকের হার-জিতের বিষয়টি সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তারপর কে ঈমান ও সৎকাজের পথ অবলম্বন করেছিল আর কে কুফর ও মিথ্যার পথ অনুসরণ করেছিল তার ভিত্তিতেই সমস্ত মানুষের ভাগ্যের চূড়ান্ত ফায়সালা করা হবে। প্রথম দলটি চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হবে এবং দ্বিতীয় দলটির ভাগে পড়বে স্থায়ী জাহান্নাম।

এরপর ঈমানের পথ অনুসরণকারীদের উদ্দেশ করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে ঃ

এক ঃ দুনিয়াতে যে বিপদ–মুসিবত আসে তা আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদনক্রমেই আসে। এরূপ পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ঈমানের ওপর অবিচল থাকে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি অস্থির ও ক্রোধান্বিত হয়ে ঈমানের পথ থেকে সরে যাবে, তার বিপদ–মুসিবত তো মূলত আল্লাহর অনুমতি ও অনুমোদন ছাড়া দূরীভূত হবে না; তবে সে আরো একটি বড় মুসিবত ডেকে আনবে। তাহলো, তার মন আল্লাহর হিদায়াত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

দুই ঃ শুধু ঈমান গ্রহণ করাই মু'মিনের কাজ নয়। বরং ঈমান গ্রহণ করার পর তার উচিত কার্যত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করা। সে যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিজের ক্ষতির জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কেননা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বিধান পৌঁছিয়ে দিয়ে দায়িত্বমুক্ত হয়ে গিয়েছেন।

তিন ঃ এক মু'মিন বান্দার ভরসা ও নির্ভরতা নিজের শক্তি অথবা পৃথিবীর অন্য কোন শক্তির ওপর না হয়ে কেবল আল্লাহর ওপর হতে হবে।

চার ঃ মু'মিনের জন্য তার অর্থ–সম্পদ, পরিবার–পরিজন ও সন্তান–সন্ততি একটা বড় পরীক্ষা। কারণ ঐগুলোর ভালবাসাই মানুষকে ঈমান ও আনুগত্যের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে। সে জন্য ঈমানদার ব্যক্তিকে তার পরিবার–পরিজন ও সন্তান–সন্ততি সম্পর্কে সাবধান থাকতে হবে যাতে তারা পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ কোনভাবেই তাদের জন্য আল্লাহর পথের ডাকাত ও লুটেরা হয়ে না বসে। তাছাড়া তাদের উচিত অর্থ–সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করা যাতে তাদের মন–মানসিকতা অর্থ পূজার ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকে।

পাঁচ ঃ প্রত্যেক মানুষ তার সাধ্যানুসারে শরীয়াতের বিধি–বিধান পালনের জন্য আদিষ্ট। আল্লাহ তা'আলা মানুষের কাছে তার শক্তি ও সামর্থের অধিক কিছু করার দাবী করেন না। তবে একজন মু'মিনের যা করা উচিত তাহলো, সে তার সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করতে কোন ত্রুটি করবে না এবং তার কথা, কাজ ও আচার–আচরণ তার নিজের ত্রুটি ও অসাবধানতার জন্য যেন আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ অতিক্রম না করে।

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۫ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ① هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ②

আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তার সবই আল্লাহর তাসবীহ করছে।[১] তিনিই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী[২] এবং সব প্রশংসাও তারই।[৩] তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।[৪] তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতপর তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কাফের এবং কেউ মু'মিন।[৫] তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন।[৬]

১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল হাদীদ, টীকা ১। এ আয়াতাংশ দিয়ে বক্তব্য শুরু করার কারণ পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে আপনা থেকেই বোধগম্য হয়। পরবর্তী আয়াতসমূহে বিশ্ব–জাহান এবং মানুষ সৃষ্টির যে তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, এর স্রষ্টা, মালিক ও শাসক একমাত্র আল্লাহ। তিনি এই বিশ্ব–জাহানকে অযৌক্তিক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে সৃষ্টি করেননি। তাছাড়া মানুষকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়েও ছেড়ে দেয়া হয়নি যে, সে যা ইচ্ছা তাই করে বেড়াবে অথচ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ থাকবে না। এই বিশ্ব–জাহানের শাসক এমন কোন বেখবর বাদশাহও নন যে, তাঁর সাম্রাজ্যে যা কিছু ঘটছে তা তাঁর আদৌ জানা থাকবে না। এ ধরনের বিষয়বস্তু বর্ণনা করার জন্য সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত সূচনা কথা বা ভূমিকা যা হতে পারতো সংক্ষিপ্ত এ আয়াতাংশে তাই বলা হয়েছে। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুসারে এই ভূমিকা বা সূচনা কথার অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে শুরু করে মহাকাশের সর্বশেষ বিস্তৃতি পর্যন্ত যেদিকেই তাকাও না কেন যদি তোমরা বিবেক–বুদ্ধিহীন না হয়ে থাক তাহলে পরিষ্কার বুঝতে পারবে যে, পরমাণু থেকে নিয়ে বিশাল ছায়াপথ পর্যন্ত সবকিছুই শুধুমাত্র আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষই দিচ্ছে না বরং তিনি যে সব রকম দোষ–ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা এবং ভুল–ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পবিত্র সে সাক্ষও দিচ্ছে। তার সত্তা ও গুণাবলী এবং তাঁর কাজকর্ম ও আদেশ–নিষেধসমূহে যদি কোন প্রকার কলুষ–কালিমা ও ভুল–ত্রুটি কিংবা কোন দুর্বলতা ও অপূর্ণতার নামমাত্র সম্ভাবনাও থাকতো তাহলে চরম

পূর্ণতাপ্রাপ্ত এই যুক্তিভিত্তিক ও জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা আদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত এই অলংঘনীয় ও অবিচল পন্থায় চলা তো দূরের কথা অস্তিত্ব লাভ করতেও পারতো না।

২. অর্থাৎ এ গোটা বিশ্ব–জাহান তাঁরই সাম্রাজ্য। তিনি একে সৃষ্টি করে এবং একবার চালু করে দিয়েই ক্ষান্ত হননি, বরং তিনিই এর ওপর কার্যত সার্বক্ষণিক শাসন পরিচালনা করছেন। এই শাসন ও কর্তৃত্বে অন্য কারো আদৌ কোন অংশ বা অধিকার নেই। এই বিশ্ব–জাহানের কোন জায়গায় কেউ যদি সাময়িকভাবে সীমিত পর্যায়ে ক্ষমতা কিংবা মালিকানা অথবা শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে থাকে তাহলে তা তার নিজের শক্তিতে অর্জিত ক্ষমতা ও ইখতিয়ার নয় বরং আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ার। আল্লাহ যতদিন চান ততদিন তা তার অধিকারে থাকে এবং যখনই চান তা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিতে পারেন।

৩. অন্য কথায় তিনি একাই কেবল প্রশংসার যোগ্য। অন্য আর যার মধ্যেই প্রশংসার যোগ্য কোন গুণ বা সৌন্দর্য আছে তা তারই দেয়া। আর حمد শব্দকে যদি শোকর বা কৃতজ্ঞতা অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে শোকর ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার প্রকৃত অধিকারীও কেবল তিনিই। কারণ সমস্ত নিয়ামত তাঁরই সৃষ্টি এবং সমস্ত সৃষ্টিরও প্রকৃত উপকারী ও কল্যাণদাতাও তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন উপকারের জন্য আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তা করি এই জন্য যে, ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিয়ামত আমাদের কাছে পৌছিয়ে দিয়েছেন। অন্যথায় সে যেমন এই নিয়ামতের স্রষ্টা নয়, তেমনি আল্লাহর দেয়া তাওফীক ও সামর্থ ছাড়া সে ঐ নিয়ামত আমাদের কাছে পৌছাতেও সক্ষম হতো না।

৪. অর্থাৎ তিনি চূড়ান্ত ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে সক্ষম। তাঁর ক্ষমতা ও সামর্থকে সীমিত করার মত কোন শক্তি নেই।

৫. একথাটির চারটি অর্থ এবং চারটি অর্থই যথাস্থানে সঠিক ঃ

এক ঃ তিনিই তোমাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেউ তাঁর সৃষ্টিকর্তা হওয়ার বিষয়টি অস্বীকার আর কেউ এ সত্যটিকে স্বীকার করে। আয়াতের প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ এক সাথে মিলিয়ে পড়লে সর্বপ্রথম এ অর্থটিই বোধগম্য হয়।

দুই ঃ তোমরা ইচ্ছা করলে কুফরীর পথ অবলম্বন করতে পার আবার ইচ্ছা করলে ঈমানও গ্রহণ করতে পার। এভাবে তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ঈমান ও কুফরীর দু'টি পথের কোনটি গ্রহণ করতেই তিনি তোমাদের বাধ্য করেননি। তাই নিজেদের ঈমান ও কুফরীর ব্যাপারে তোমরা নিজেরাই দায়ী। পরবর্তী আয়াতাংশ "তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ তা সবই দেখছেন" এ অর্থ সমর্থন করে। অর্থাৎ এই স্বাধীনতা ও ইখতিয়ার দিয়ে তিনি তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। এই ইখতিয়ার ও স্বাধীনতাকে তোমরা কিভাবে কাজে লাগাও তিনি তা দেখছেন।

তিন ঃ তিনি তো তোমাদেরকে সুস্থ বিবেক–বুদ্ধি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এই সুস্থ বিবেক–বুদ্ধির দাবী হলো, তোমরা সবাই ঈমানের পথ অবলম্বন করবে। কিন্তু এই সুস্থ প্রকৃতির ওপর জন্মগ্রহণ করা সত্ত্বেও তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের জন্মগত স্বভাব–প্রকৃতির পরিপন্থী কুফরীর পথ অনুসরণ করেছে। আবার কেউ কেউ তাদের

জন্মগত স্বভাব-প্রকৃতির অনুকূল ঈমানের পথ অনুসরণ করেছে। এ আয়াতটিকে সূরা রূমের ৩০নং আয়াতের সাথে মিলিয়ে পড়লে এ অর্থটিই বোধগম্য হয়। সূরা রূমের ঐ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ "তুমি একাগ্র ও একনিষ্ঠ হয়ে নিজের লক্ষ ও মনযোগকে দীনের দিকে করে দাও এবং যে প্রকৃতির ওপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সেই প্রকৃতির ওপর নিজেকে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর বানানো স্বভাব-প্রকৃতি বদলানো যাবে না। এটিই পুরোপুরি সত্য ও সঠিক দীন।" কিছু সংখ্যক হাদীস এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছে! এসব হাদীসে নবী (সা) বলেছেন যে, প্রত্যেক মানুষ সঠিক প্রকৃতির ওপর জন্মলাভ করে থাকে। কিন্তু পরে বাইরে থেকে কুফরী, শিরক ও গোমরাহী তার ওপর চড়াও হয়। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা নূর, টীকা ৪২ থেকে ৪৭)। এখানে এ বিষয়টি বিশেষ উল্লেখ্য যে, জন্মগতভাবে মানুষের পাপী হওয়ার ধারণাকে খৃষ্টবাদ দেড় হাজার বছর ধরে তাদের মৌলিক ধর্মীয় বিশ্বাস বানিয়ে রেখেছে। অথচ আসমানী কিতাবসমূহ মানুষের জন্মগতভাবে পাপী হওয়ার ধারণা কখনো পেশ করেনি। বর্তমানে ক্যাথলিক পণ্ডিত পুরোহিতগণ নিজেরাই বলতে শুরু করেছেন যে, এই ধর্মবিশ্বাসের কোন ভিত্তিই বাইবেলে নেই। বাইবেলের একজন বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত রিভারেণ্ড হার্বার্ট হগ (Haag) তাঁর "Is Original Sin In Scripture" গ্রন্থে লিখছেন, প্রথম যুগের খৃষ্টানদের মধ্যে অন্তত তৃতীয় শতক পর্যন্ত এই ধর্মীয় বিশ্বাসের কোন অস্তিত্বই ছিল না যে, মানুষ জন্মগতভাবে পাপী। এই ধ্যান-ধারণা যখন বিস্তার লাভ করতে শুরু করে তখন থেকে পরবর্তী দুইশত বছর পর্যন্ত খৃষ্টান পণ্ডিতগণ তার প্রতিবাদ করেছেন। পরবর্তী সময়ে পঞ্চম শতকে সেন্ট অগাস্টাইন যুক্তি ও কূটতর্কের জোরে এ বিশ্বাসটিকে খৃষ্টবাদের মূল ধর্মীয় বিশ্বাসের অন্তরভুক্ত করে দেয়। অর্থাৎ "মানবজাতি উত্তরাধিকার সূত্রে আদমের পাপের বোঝা লাভ করেছে। তাই ঈসা মাসীহর কাফ্ফারা বা প্রায়শ্চিত্তের সুবাদে মুক্তি লাভ করা ছাড়া মানুষের মুক্তি লাভের আর কোন উপায় নেই।"

চার ঃ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই তোমাদেরকে অস্তিত্বহীনতা থেকে অস্তিত্ব দান করেছেন। এক সময় তোমাদের কোন অস্তিত্ব ছিল না। তারপর তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছ। এটি এমন একটি ব্যাপার যে, তা নিয়ে তোমরা যদি সহজ সরলভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে তাহলে উপলব্ধি করতে পারতে যে, এই অস্তিত্বই প্রকৃতপক্ষে সেই আসল নিয়ামত যার সাহায্যে তোমরা অন্যসব নিয়ামত ভোগ করতে সক্ষম হচ্ছো। এই উপলব্ধি থাকলে তোমাদের কেউই তার স্রষ্টার সাথে কুফরী ও বিদ্রোহের আচরণ করতে পারতে না। কিন্তু তোমাদের অনেকে এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করেনি, কিংবা করে থাকলেও ভ্রান্ত পন্থায় চিন্তা-ভাবনা করেছে এবং কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে। অনেকে আবার সঠিক ও নির্ভুল চিন্তা-ভাবনার দাবী ঈমানের পথটিই অনুসরণ করেছে।

৬. এ আয়াতাংশে যে দেখার কথা বলা হয়েছে তার অর্থ শুধু দেখাই নয়, বরং আপনা থেকেই এর এই অর্থ প্রকাশ পায় যে, তোমাদের আমল অনুপাতে তোমাদের প্রতিদান ও শাস্তি দেয়া হবে। এটা ঠিক এরূপ যেন কোন শাসক কাউকে তার অধীনে চাকরিতে নিয়োগ করে বলছে যে, তুমি কিভাবে কাজ করো তা আমি দেখবো। এ ক্ষেত্রে এ ধরনের কথার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি ঠিকমত কাজ করো তাহলে পুরস্কার ও উন্নতি দান করবো। আর অন্যথা হলে কঠোরভাবে পাকড়াও করবো।

خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

তিনি আসমান ও যমীনকে যথাযথরূপে সৃষ্টি করেছেন তিনি তোমাদেরকে আকার–আকৃতি দান করেছেন এবং অতি উত্তম আকার–আকৃতি দান করেছেন। অবশেষে তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরে যেতে হবে।[৭] আসমান ও যমীনের সবকিছু সম্পর্কেই তিনি জানেন। আর তোমরা যা গোপন করো এবং যা প্রকাশ করো তাও তিনি জানেন।[৮] মানুষের অন্তরের কথাও তিনি খুব ভাল করে জানেন।[৯]

৭. এই আয়াতে গভীর যৌক্তিক সম্পর্কের পারম্পর্য ও ক্রমানুসারে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

প্রথম কথাটি বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা এই বিশ্ব–জাহানকে যথাযথ ও যৌক্তিক পরিণতির জন্য সৃষ্টি করেছেন। بالحق শব্দটি যখন কোন খবর সম্পর্কে বলা হয় তখন তার অর্থ হয় সত্য খবর। হুকুম বা নির্দেশের জন্য বলা হলে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার ভিত্তিক হুকুম বা নির্দেশ, কথার ব্যাপারে বলা হলে তার অর্থ হয় সত্য ও সঠিক কথা এবং কোন কাজ সম্পর্কে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় এমন কাজ যা বিজ্ঞোচিত ও যুক্তিসংগত, অনর্থক ও অযথা কাজ নয়। এটা স্পষ্ট যে, خلق বা সৃষ্টি করা একটি কাজ। তাই বিশ্ব–জাহান সৃষ্টি করাকে যথাযথ ও যৌক্তিক বলার অনিবার্য অর্থ এই যে, এই বিশ্ব–জাহানকে খেল–তামাশার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং এটি একজন বিজ্ঞ স্রষ্টার একান্ত সুচিন্তিত কাজ। এর প্রতিটি বস্তুর পেছনে একটি যুক্তিসংগত উদ্দেশ্য আছে। এসব সৃষ্টির মধ্যে এই উদ্দেশ্যবাদ এতই সুস্পষ্ট যে, বিবেক–বুদ্ধিসম্পন্ন কোন মানুষ যদি এর কোনটির রূপ প্রকৃতি ভালভাবে বুঝতে পারে তাহলে ঐ জিনিস সৃষ্টির যৌক্তিক ও বিজ্ঞোচিত উদ্দেশ্য কি হতে পারে তা জানা তার জন্য কঠিন কাজ নয়। পৃথিবীতে মানুষের সমস্ত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাক্ষ দিচ্ছে যে, গভীর চিন্তা–ভাবনা, গবেষণা এবং অনুসন্ধান দ্বারা মানুষ যে জিনিসেরই রূপ–প্রকৃতি বুঝাতে সক্ষম হয়েছে শেষ পর্যন্ত ঐ জিনিস সম্পর্কে সে একথাও জানতে পেরেছে যে, তা কোন্ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে আর সেই উদ্দেশ্যকে জানা ও বুঝার পরই সে এমন অসংখ্য জিনিস আবিষ্কার করেছে যা বর্তমানে মানব সভ্যতার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ বিশ্ব–জাহান যদি কোন ক্রীড়ামোদীর খেলার উপকরণ হতো এবং এর মধ্যে কোন যুক্তি ও উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল না থাকতো তাহলে এসব আবিষ্কার উদ্ভাবন কখনো সম্ভব হতো না। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আনয়াম, টীকা ৪৬; ইউনুস, টীকা ১১; ইবরাহীম, টীকা ২৬; আন নাহল্, টীকা ৬; আল আম্বিয়া, টীকা ১৫—১৬; আল মু'মিনূন, টীকা ১০২; আল আনকাবূত, টীকা ৭৫; আর রূম, টীকা ৬; আদ্ দুখান, টীকা ৩৪; আল জাসিয়া, টীকা ২৮)।

দ্বিতীয় কথাটি বলা হয়েছে এই যে, আল্লাহ এই বিশ্ব–জাহানে মানুষকে সর্বোত্তম আকার আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। আকার আকৃতি অর্থ শুধু মানুষের চেহারা নয়। বরং এর অর্থ তার গোটা দৈহিক কাঠামো এবং দুনিয়াতে কাজ করার জন্য তাকে দেয়া সব রকম শক্তি ও যোগ্যতাও এর মধ্যে অন্তরভুক্ত। এই দু'টি দিক দিয়ে মানুষকে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে সর্বোত্তম করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর এ কারণেই সে পৃথিবী ও তার আশেপাশের সমস্ত সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার যোগ্য হয়েছে। তাকে দীর্ঘ দেহ কাঠামো দেয়া হয়েছে, চলাফেরার জন্য উপযুক্ত পা দেয়া হয়েছে এবং কাজ–কর্ম করার জন্য উপযুক্ত হাত দেয়া হয়েছে। তাকে এমন সব ইন্দ্রিয় এবং জ্ঞান আহরণ যন্ত্র দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে সব রকম তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তাকে চিন্তা–ভাবনা করার, বুঝার এবং বিভিন্ন তথ্য একত্র করে তা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার মত উন্নত পর্যায়ের একটি মস্তিষ্ক ও চিন্তা শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি নৈতিক বোধ ও অনুভূতি এবং ভালমন্দ ও ভুল শুদ্ধ নিরূপক শক্তি দেয়া হয়েছে। তাকে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী শক্তি দেয়া হয়েছে যার সাহায্যে সে নিজেই তার চলার পথ বেছে নেয় এবং কোন পথে সে তার চেষ্টা–সাধনা নিয়োজিত করবে আর কোন পথে করবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাকে এতটা স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে যে, সে ইচ্ছা করলে তার স্রষ্টাকে মানতে এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে পারে, কিংবা তাঁকে অস্বীকার করতে পারে কিংবা যাদেরকে ইচ্ছা সে তার খোদা বানিয়ে নিতে পারে অথবা যাকে সে খোদা বলে স্বীকার করে ইচ্ছা করলে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও করতে পারে। এসব শক্তি এবং ক্ষমতা ও ইখতিয়ার দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাকে তাঁর অসংখ্য সৃষ্টির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। আর কার্যত সে এ ক্ষমতা প্রয়োগও করছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আল মু'মিন, টীকা ৯১)

ওপরে বর্ণিত এ দু'টি কথার যৌক্তিক ফলাফল হিসেবে এই আয়াতের তৃতীয় অংশে বর্ণিত কথাটি আপনা থেকেই এসে পড়ে। আয়াতটির এই অংশে বলা হয়েছে ঃ "অবশেষে তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।" একথা স্পষ্ট যে, এরূপ একটি যুক্তিসঙ্গত ও উদ্দেশ্যমূলক বিশ্ব–ব্যবস্থায় এমন স্বাধীন একটি সৃষ্টিকে যখন সৃষ্টি করা হয়েছে তখন যুক্তির দাবী কখনো এটা হতে পারে না যে, তাকে এখানে দায়িত্বহীন বানিয়ে লাগামহীন উটের মত ছেড়ে দেয়া হবে। বরং এর অনিবার্য দাবী হবে যিনি তাকে ক্ষমতা, ইখতিয়ার ও স্বাধীনতা দিয়ে তাঁর সৃষ্ট জগতে এই মর্যাদা ও অবস্থান দিয়েছেন তাঁর সামনে সে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। এই আয়াতে উল্লেখিত "ফিরে যাওয়া" এর অর্থ নিছক ফিরে যাওয়া নয়, বরং এর অর্থ জবাবদিহির জন্য ফিরে যাওয়া। পরবর্তী আয়াতসমূহে স্পষ্ট করে দেয়া হয়েছে যে, এই ফিরে যাওয়াটা পার্থিব এই জীবনে হবে না বরং মৃত্যুর পরের আরেকটি জীবনে হবে। গোটা মানব জাতিকে পুনরায় জীবিত করে হিসেব–নিকেশ গ্রহণের জন্য যখন এক সাথে একই সময়ে জড়ো করা হবে, সেটি হবে এর প্রকৃত সময়। আর সেই হিসেব–নিকেশের ফলাফল স্বরূপ পুরস্কার ও শাস্তির ভিত্তি হবে মানুষ আল্লাহর দেয়া ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে সঠিক পন্থায় কাজে লাগিয়েছে, না ভুল পন্থায় কাজে লাগিয়েছে তার ওপর। এখন প্রশ্ন হলো, জবাবদিহির এই কাজটি দুনিয়ার বর্তমান এই জীবনে হওয়া সম্ভব নয় কেন? আর এর প্রকৃত সময় মৃত্যুর পরের জীবনই বা কেন? তাছাড়া এ পৃথিবীর গোটা মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আগের ও পরের সব

মানুষকে যে সময় পুনরায় জীবিত করে জড়ো করা হবে সে সময়টিই বা এর প্রকৃত সময় হবে কেন? মানুষ যদি বিবেক–বুদ্ধিকে কিছুটা কাজে লাগায় তাহলে সে বুঝতে পারবে যে, এ সবই যুক্তিসঙ্গত ব্যাপার। সে এ কথাও বুঝতে পারবে যে, জ্ঞান ও বিবেক–বুদ্ধির দাবী হলো, মানুষের হিসেব–নিকেশ ও জবাবদিহির কাজটি মৃত্যুর পরের জীবনেই হওয়া দরকার এবং সমস্ত মানুষের এক সাথে হওয়া দরকার। এর প্রথম কারণ হচ্ছে, মানুষকে জবাবদিহি করতে হবে তার গোটা জীবনের কাজকর্মের জন্য। তাই তার জীবনের সমস্ত কাজকর্ম ও দায়িত্ব–কর্তব্যের জন্য জবাবদিহির সঠিক ও অনিবার্য সময় সেটিই হওয়া উচিত যখন তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, মানুষের কাজ–কর্মের ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব তার মৃত্যুর পরপরই শেষ হয়ে যায় না। তা যেমন অন্য মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলে এবং প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সৃষ্টি করে, তেমনি তার মৃত্যুর পরেও তা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এসব ফলাফল, প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার জন্য সে–ই দায়ী। তাই সঠিক জবাবদিহি ও হিসেব–নিকেশ কেবল তখনই হতে পারে যখন গোটা মানব জাতির জীবন কর্মের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাবে এবং আগের ও পরের সমস্ত মানুষকে একই সময়ে একত্রিত করা হবে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৩০; ইউনুস, টীকা ১০—১১; হূদ, টীকা ১০৫; আন নাহল, টীকা ৩৫; আল হাজ্জ, টীকা ৯; আন নাম্‌ল, টীকা ২৭; আর রূম, টীকা ৫—৬; সোয়াদ, টীকা ২৯—৩০; আল মু'মিন, টীকা ৮০; আল জাসিয়া, টীকা ২৭ থেকে ২৯)।

৮. এর আরেকটি অনুবাদ হতে পারে "যা তোমরা গোপনে করো এবং যা তোমরা প্রকাশ্যে করো।"

৯. অর্থাৎ তিনি শুধু সেই সব কাজ–কর্ম সম্পর্কেই অবগত নন যা মানুষের গোচরে আসে বরং সেই সব কাজ–কর্ম সম্পর্কেও তিনি অবহিত যা সবার কাছেই গোপন থাকে। তাছাড়াও তিনি শুধু কাজ–কর্মের বাহ্যিক রূপটাই দেখেন না বরং মানুষের প্রতিটি কাজের পেছনে কি ধরনের ইচ্ছা–আকাংখা এবং উদ্দেশ্য সক্রিয়া ছিল, সে যা করেছে তা কি নিয়তে করেছে এবং কি বুঝে করেছে তাও তিনি জানেন। এটা এমন এক সত্য, যে বিষয়ে চিন্তা করলে মানুষ বুঝতে পারবে যে, ইনসাফ ও সুবিচার কেবল আখেরাতেই হতে পারে এবং শুধু আল্লাহ তা'আলার আদালতেই ইনসাফ হওয়া সম্ভব। মানুষের বিবেক–বুদ্ধিও দাবী করে যে, মানুষের তার প্রতিটি অপরাধের জন্য শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু কে না জানে যে, কৃত অপরাধের বেশীর ভাগই দুনিয়াতে হয় গোপন থাকে নয়তো প্রয়োজনীয় সাক্ষ প্রমাণ না পাওয়ার কারণে অপরাধী নিষ্কৃতি পেয়ে যায়। কিংবা অপরাধ প্রকাশ পেয়ে গেলেও অপরাধী এমন প্রভাবশালী ও ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে যে, তাকে শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় না। মানুষের বিবেক–বুদ্ধি এও দাবী করে যে, কোন ব্যক্তির কাজের ধরন ও প্রকৃতি শুধু অপরাধমূলক কাজের মত হলেই তার শাস্তি না পাওয়া উচিত। বরং এই মর্মে তার অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা হওয়া উচিত যে, যে কাজ সে করেছে তা ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে বুঝে করেছে কিনা। এ অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনাও হওয়া উচিত যে, ঐ কাজ করার সময় সে একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিসেবেই তা করছিল। অপরাধ সংঘটনই তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল এবং সে এ কথাও জানতো যে, সে যা করছে তা অপরাধ। এ কারণে দুনিয়ার বিচারালয়সমূহ মামলা মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে এসব

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا ۚ وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝

এরপূর্বে যেসব মানুষ কুফরী করেছে এবং নিজেদের অপকর্মের পরিণামও ভোগ করেছে তাদের খবর কি তোমাদের কাছে পৌছেনি? তাদের জন্য নির্দিষ্ট আছে অতীব কষ্টদায়ক শাস্তি।[১০] তারা এরূপ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে এ কারণে যে, তাদের কাছে যেসব রসূল এসেছেন তাঁরা স্পষ্ট দলীল–প্রমাণ নিয়ে তাদের কাছে এসেছিলেন।[১১] কিন্তু তারা বলেছিল ঃ মানুষ কি আমাদের হিদায়াত দান করবে?[১২] এভাবে তারা মানতে অস্বীকৃতি জানালো এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। তখন আল্লাহও তাদের তোয়াক্কা করলেন না। আল্লাহ তো আদৌ কারো মুখাপেক্ষীই নন। তিনি আপন সত্তায় প্রশংসিত।[১৩]

বিষয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে থাকে এবং এসব বিষয়ের অনুসন্ধানকে সুবিচার নীতির দাবী বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই পৃথিবীতে সত্যি সত্যিই কি এমন কোন উপায়–উপকরণ আছে যার সাহায্যে এ বিষয়ে এমন ন্যায়ানুগ অনুসন্ধান হতে পারে যা সব রকম সংশয়ের উর্ধে? এদিক দিয়ে বিচার করলে এ আয়াতটিও আল্লাহ তা'আলার এই বাণীর সাথে গভীর যৌক্তিক সম্পর্ক বিদ্যমান যাতে বলা হয়েছে ঃ "তিনি আসমান ও যমীনকে যৌক্তিক পরিণামের জন্য সৃষ্টি করেছেন।" যৌক্তিক পরিণামের জন্য সৃষ্টি করার অনিবার্য দাবী হলো, এই বিশ্ব–জাহানে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ন্যায়বিচার থাকবে। এ ধরনের ন্যায়বিচার কেবল তখনই কায়েম হতে পারে যখন ন্যায়বিচারকারীর দৃষ্টি থেকে মানুষের মত দায়িত্বশীল সৃষ্টির কোন কাজ শুধু গোপন থাকবে না তাই নয়, বরং যে নিয়ত ও উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি কোন কাজ করেছে তাও তাঁর থেকে গোপন থাকবে না। এ কথা স্পষ্ট যে, বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ছাড়া আর কোন সত্তা এমন হতে পারে না যার দ্বারা এরূপ ন্যায়বিচার কায়েম হতে পারে। এমন কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তা হলে সে যেন প্রকারান্তরে এ দাবীই করছে যে, আমরা এমন বিশ্ব–জাহানে বাস করছি যেখানে বাস্তবে কোন ইনসাফ নেই, এমনকি ইনসাফের কোন সম্ভাবনাই নেই। এরূপ আহম্মকি ও নির্বুদ্ধিতামূলক ধ্যান–ধারণায় যে ব্যক্তির জ্ঞানবুদ্ধি এবং মন ও বিবেক সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত সে যদি নিজেকে প্রগতিবাদী ও যুক্তিবাদী মনে করে এবং বিশ্ব–জাহান সম্পর্কে কুরআনের পেশকৃত এই চরম যুক্তিগ্রাহ্য ধারণাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন বা প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা বলে মনে করে তাহলে তার মত চরম নির্লজ্জ ও বেহায়া আর কেউই নেই।

১০. অর্থাৎ তারা নিজেদের কৃতকর্মের যে শাস্তি পৃথিবীতে ভোগ করেছে তা তাদের অপরাধসমূহের উপযুক্ত শাস্তি যেমন নয় তেমনি পুরো শাস্তিও নয়। পূর্ণাঙ্গ ও যথোপযুক্ত

শাস্তি তাদেরকে ভোগ করতে হবে আখেরাতে। তবে তাদের ওপর পৃথিবীতে যে আযাব এসেছে তা থেকে মানুষ এ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে যে, যে জাতিই তাদের রবের সাথে কুফরীর আচরণ করেছে, তারা কেমন করে ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কেমন পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৫—৬; হূদ, টীকা ১০৫)।

১১. মূল আয়াতে 'বাইয়েনাত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দটির অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। আরবী ভাষায় بين বলা হয় এমন জিনিসকে যা প্রকাশ্য ও স্পষ্ট। নবী–রসূলগণ بينات নিয়ে আসতেন এ কথার অর্থ প্রথমত এই যে, তাঁরা এমনসব স্পষ্ট প্রমাণ ও নিদর্শন নিয়ে আসতেন যা সরাসরি প্রমাণ করতো, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট। দ্বিতীয়ত, তাঁরা যেসব কথা পেশ করতেন তা খুবই যুক্তিসঙ্গতভাবে ও উজ্জ্বল দলীল–প্রমাণাদিসহ পেশ করতেন। তৃতীয়ত, তাঁদের শিক্ষায় কোন অস্পষ্টতা ছিল না, বরং হক কি এবং বাতিল কি, জায়েয কি এবং নাজায়েয কি এবং কোন পথে মানুষের চলা উচিত আর কোন পথে চলা উচিত নয় তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় তাঁরা বলে দিতেন।

১২. এটা ছিল তাদের ধ্বংসের প্রাথমিক ও মূল কারণ। স্রষ্টা কর্তৃক সঠিক জ্ঞান দেয়া ছাড়া মানুষের পক্ষে দুনিয়ায় সঠিক কর্মপন্থা বেছে নেয়া সম্ভব ছিল না। আর স্রষ্টার পক্ষ থেকে মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে জ্ঞান দান করে অন্যদের কাছে তা পৌছানোর দায়িত্ব অর্পণ করা ছাড়া মানুষকে জ্ঞান দানের আর কোন বাস্তব পন্থাও হতে পারতো না। এ উদ্দেশ্যেই তিনি بينات সহ নবী–রসূলদের পাঠিয়েছেন যাতে তাঁদের সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ মানুষের কাছে না থাকে। কিন্তু মানুষ আল্লাহর রসূল হতে পারে এ কথা তারা আদৌ মানতে রাজি হলো না, বরং অস্বীকৃতি জানিয়ে বসলো। এরপর তাদের হিদায়াত পাওয়ার আর কোর উপায়ই রইল না। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ইয়াসীন, টীকা ১১)। এ ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট মানুষদের মূর্খতা ও জ্ঞানহীনতার যে বিস্ময়কর বিষয়টি আমাদের কাছে ধরা পড়ে তা হলো, মানুষের দিকনির্দেশনা মেনে নিতে তো তারা কোন সময়ই দ্বিধা করেনি। এমন কি মানুষের দিকনির্দেশনা অনুসরণ করেই তারা কাঠ ও পাথরের মূর্তিকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, এই মানুষকেই খোদা, খোদার অবতার এবং খোদার পুত্র বলেও স্বীকার করেছে। আর পথভ্রষ্ট নেতাদের অন্ধ আনুগত্য করতে গিয়ে এমন সব অদ্ভুত পথ ও পন্থা গ্রহণ করেছে যা মানুষের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও নৈতিকতাকে উলট–পালট করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহর রসূল যখন তাদের কাছে সত্য ও ন্যায় নিয়ে এসেছেন এবং সকল ব্যক্তিস্বার্থের উর্ধে উঠে তাদের কাছে নির্ভেজাল সত্য পেশ করেছেন তখন তারা বলেছে ঃ "আপনি তো মানুষ। আর মানুষ হয়ে আমাদের হিদায়াত দিবেন কি করে?" এর মানে হলো, মানুষ যদি পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত করে তাহলে তাকে সাদরে গ্রহণ করা হবে। কিন্তু যদি সত্য, সঠিক ও ন্যায়ের পথ দেখায় তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৩. অর্থাৎ তারা যখন আল্লাহর দেয়া হিদায়াতের পরোয়া করলো না তখন তারা গোমরাহীর কোন্ গহ্বরে পতিত হতে যাচ্ছে, আল্লাহও তার পরোয়া করলেন না। কোন ব্যাপারেই আল্লাহ তাদের কাছে ঠেকা ছিলেন না যে, তারা তাকে খোদা হিসেবে মানলে

زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ؕ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ؕ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۞

অস্বীকারকারীরা দাবী করে বলেছে যে, মরার পরে আর কখনো তাদের জীবিত করে উঠানো হবে না।[১৪] তাদের বলে দাও, আমার রবের শপথ, তোমাদের অবশ্যই উঠানো হবে।[১৫] তারপর (দুনিয়ায়) তোমরা যা করেছো তা অবশ্যই তোমাদেরকে অবহিত করা হবে।[১৬] এরূপ করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।[১৭]

তবেই তিনি খোদা থাকবেন অন্যথায় তাঁর কর্তৃত্বের আসন হাত ছাড়া হয়ে যাবে। তিনি তাদের ইবাদাত–বন্দেগীরও মুখাপেক্ষী নন কিংবা প্রশংসা ও স্তব–স্তুতিরও মুখাপেক্ষী নন। তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্যই তিনি তাদেরকে সত্য ও সঠিক পথ দেখাতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলে আল্লাহও তাদের প্রতি বিমুখ হয়ে গেলেন। এরপর আল্লাহ তাদেরকে না হিদায়াত দিয়েছেন, না রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন, না তাদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করেছেন এবং না নিজেদের ওপর ধ্বংস ডেকে আনা থেকে বাধা দিয়েছেন। কারণ তারা নিজেরাই তাঁর হিদায়াত ও বন্ধুত্ব লাভের আকাঙ্খী ছিল না।

১৪. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই ন্যায় ও সত্যের অস্বীকারকারীরা মৌলিক একটি গোমরাহীর মধ্যে ডুবে রয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সেটিই তাদের ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গোমরাহীটি হলো মৃত্যুর পরে আর কোন জীবন নেই, আখেরাত অস্বীকারকারীদের কাছে এ কথা জানার কোন উপায় না পূর্বে ছিল, না এখন আছে, না কখনো থাকতে পারে। কিন্তু এসব মূর্খতা চিরদিনই জোর গলায় সে দাবী করেছে। অথচ চূড়ান্তভাবে আখেরাতকে অস্বীকার করার কোন যুক্তিসংগত ও জ্ঞানগত ভিত্তি নেই।

১৫. কুরআন মজীদে এটা তৃতীয় স্থান যেখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে (সা) বলেছেন ঃ তোমার রবের শপথ করে বলো, অবশ্যই তা হবে। প্রথমে সূরা ইউনুসে বলেছেন ঃ

وَيَسْتَنْۢبِئُوْنَكَ اَحَقٌّ هُوَ ؕ قُلْ اِىْ وَرَبِّىْٓ اِنَّهٗ لَحَقٌّ ؔ وَمَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ

"তারা জিজ্ঞেস করে, তা কি সত্যি সত্যিই হবে? বলো, আমার রবের শপথ, তা অবশ্যই সত্য। তোমরা এত ক্ষমতাশালী নও যে, তা বাধা দিয়ে ঠেকাতে পার।"

(আয়াত ঃ ৫৩)

পরে সূরা সাবায় বলা হয়েছে ঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَاْتِيْنَا السَّاعَةُ قُلْ بَلٰى وَرَبِّىْ لَتَاْتِيَنَّكُمْ –

"অস্বীকারকারীরা বলে, কি ব্যাপার! আমাদের ওপর কিয়ামত আসছে না কেন? বলো, আমার রবের শপথ। তা তোমাদের ওপর অবশ্যই আসবে।" (আয়াত ৩)

এখানে এই মর্মে একটি প্রশ্ন দেখা দেয় যে, একজন আখেরাত অস্বীকারকারীকে আপনি আখেরাতের কথা শপথ করে বলেন আর শপথ ছাড়া বলেন তাতে তার জন্য এমন কি এসে যায়? জিনিসটিকে যখন সে স্বীকারই করে না তখন আপনি কেবল শপথ করে বললেই সে তা মেনে নেবে কেন? এর জবাব হলো, প্রথমত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন লোকদের উদ্দেশ করে তাঁর বক্তব্য পেশ করছিলেন যারা নিজেদের ব্যক্তিগত জানা শোনা ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ কথা ভাল করে জানতো যে, ঐ ব্যক্তি সারা জীবনে কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। তাই মুখে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যত অপবাদই রটনা করুক না কেন অন্তরে কখনো একথা কল্পনা করতে পারতো না যে, এমন সত্যবাদী লোকটি আল্লাহর শপথ করে কোন সময় এমন কথা বলতে পারেন যা সত্য হওয়ার পুরো বিশ্বাস তাঁর নেই। দ্বিতীয়ত তিনি শুধু আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসের কথাই পেশ করতেন না, বরং তার স্বপক্ষে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণাদিও পেশ করতেন। কিন্তু যে জিনিসটি একজন নবী ও অনবীর মধ্যে পার্থক্য করে তা হচ্ছে, একজন অনবী আখেরাতের স্বপক্ষে যে অখণ্ডনীয় দলীল–প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম তার ফায়দা বড় জোর এতটুকু হতে পারে যে, আখেরাত সংঘটিত না হওয়ার চেয়ে হওয়াটাই অধিক যুক্তিসংগত এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হবে। অপরদিকে একজন নবীর মর্যাদা ও স্থান একজন দার্শনিকের মর্যাদা ও স্থান থেকে অনেক উর্ধে। আখেরাত হওয়া উচিত, যুক্তিভিত্তিক দলীল–প্রমাণের সাহায্যে তিনি এ সিদ্ধান্তে পৌছেননি। তাঁর প্রকৃত পদমর্যাদা ও অবস্থান তা নয়। বরং তাঁর প্রকৃত পদমর্যাদা ও অবস্থান হলো, আখেরাত যে হবে সে বিষয়ে তিনি প্রকৃত ও চাক্ষুস জ্ঞানের অধিকারী। তাই আখেরাত অবশ্যই সংঘটিত হবে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই তিনি সে কথা বলেন। তাই একজন নবীই কেবল শপথ করে একথা বলতে পারেন। কোন দার্শনিকের পক্ষে এ ব্যাপারে শপথ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া একজন নবীর বক্তব্যের ভিত্তিতেই কেবল আখেরাতের প্রতি ঈমান সৃষ্টি হতে পারে। দার্শনিকের যুক্তিতর্কের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই। অন্যেরা তো দূরের কথা দার্শনিক নিজেও তার দলীল–প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে নিজের ঈমানী আকীদা পোষণ করতে পারে না। দার্শনিক যদি সত্যিই সুষ্ঠু ও সঠিক চিন্তার অধিকারী দার্শনিক হয়ে থাকেন তাহলে সে "হওয়া উচিত" বলার অধিক কিছুই বলতে পারেন না। "এটিই ঠিক" এবং "নিশ্চিতভাবেই এটি ঠিক" কোন বিষয় সম্পর্কে এ কথাটি কেবল নবীই বলতে পারেন।

১৬. এ উদ্দেশ্যেই মৃত্যুর পরে মানুষকে পুনরায় উঠানো হবে। এবং এরূপ করার প্রয়োজন কি এর মধ্যে সে প্রশ্নেরও জবাব আছে। সূরার শুরু থেকে ৪ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যে আলোচনা করা হয়েছে তা যদি সামনে থাকে তাহলে এ কথাটি সহজেই বোধগম্য হয় যে, সত্য ও ন্যায়ভিত্তিক এবং যুক্তিনির্ভর এই বিশ্ব–জাহানে যে মাখলুক বা সৃষ্টিকে ঈমান ও কুফরের যে কোন একটি পথ অনুসরণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে, যাকে এই বিশ্ব–জাহানের বহু সংখ্যক জিনিসের ওপরে কর্তৃত্ব খাটানোর ক্ষমতা দান করা হয়েছে এবং যে কুফরী বা ঈমানের পথ অনুসরণ করে এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে সারা জীবনভর সঠিক বা ভ্রান্ত পথে ব্যবহার করে নিজের দায়িত্বে অসংখ্য নেক কাজ বা অসংখ্য মন্দ কাজ করেছে তার সম্পর্কে এ ধারণা পোষণ নিতান্তই অযৌক্তিক যে, তার এই ভাল কাজের কল্যাণকর দিক এবং মন্দ কাজের ক্ষতিকর দিক সবই নিষ্ফল ও পরিণামহীন থাকবে এবং তার এসব কাজের ভাল–মন্দ যাঁচাই বাছাই করার কোন অবকাশ কখনো

فَـاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝٨ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ؕ وَمَنْ يُّؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝٩ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝١٠

তাই ঈমান আন আল্লাহ, তাঁর রসূল এবং সেই 'নূর' বা আলোর প্রতি যা আমি নাযিল করেছি।[১৮] আর তোমরা যা কিছু করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত। (এ বিষয়ে তোমরা টের পাবে সেইদিন) যখন একত্র করার দিন তোমাদের সবাইকে তিনি একত্র করবেন।[১৯] সেদিনটি হবে তোমাদের পরস্পরের হার–জিতের দিন।[২০] যে আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করে[২১] আল্লাহ তা'আলা তার গোনাহ মুছে ফেলবেন আর তাকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে ঝরণা বইতে থাকবে। এসব লোক চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। এটাই বড় সফলতা আর যারা কুফরী করেছে এবং আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলেছে[২২] তারাই দোযখের বাসিন্দা হবে। তারা চিরস্থায়ীভাবে সেখানে থাকবে। তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্থান।

আসবে না। যে ব্যক্তি এ ধরনের অযৌক্তিক কথা বলে সে দু'টি নির্বুদ্ধিতার যে কোন একটির মধ্যে অবশ্যই নিমজ্জিত। হয় সে মনে করে যে, এই বিশ্ব–জাহান অবশ্যই যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মানুষের মত ক্ষমতা ও ইখতিয়ারসম্পন্ন সৃষ্টিকে এখানে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। অথবা সে মনে করে যে, এই বিশ্ব–জাহান এক খেয়ালী সৃষ্টি। এর সৃষ্টির পেছনে কোন জ্ঞানীর জ্ঞান ও কৌশল কাজ করেনি। প্রথম ক্ষেত্রে সে একটি পরস্পর বিরোধী কথা বলে। কারণ জ্ঞান ও যুক্তিনির্ভর বিশ্ব–জাহানে ক্ষমতা ও ইখতিয়ার সম্পন্ন একটি সৃষ্টির দায়িত্বহীন হওয়া সরাসরি ন্যায় ও যুক্তির পরিপন্থি। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সে এর কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নির্দেশ করতে পারে না যে, একটি খেয়ালী ও অযৌক্তিকভাবে সৃষ্ট বিশ্ব–জাহানে মানুষের মত বুদ্ধিমান সৃষ্টির অস্তিত্ব লাভ করা কিভাবে সম্ভব হলো এবং তার মস্তিষ্কে ন্যায় ও ইনসাফের ধারণা কোত্থেকে এলো? নির্বুদ্ধিতার মধ্য থেকে বুদ্ধির উদ্ভব এবং ন্যায় ও সুবিচারহীন অবস্থা থেকে ন্যায়ের ধারণার উদ্ভব এমন এক ব্যাপার যা কেবল একজন হঠকারী ব্যক্তির পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব কিংবা

সেই ব্যক্তির পক্ষেই মেনে নেয়া সম্ভব যে অতি মাত্রায় দর্শন কপচাতে কপচাতে মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছে।

১৭. এটি আখেরাত সংঘটিত হওয়ার দ্বিতীয় প্রমাণ। প্রথম প্রমাণটি ছিল আখেরাতের আবশ্যকতা সম্পর্কে। কিন্তু এই প্রমাণটি তার সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। এ কথা স্পষ্ট যে, যে আল্লাহর পক্ষে বিশ্ব-জাহানের এত বড় একটা ব্যবস্থা বানানো অসম্ভব হয়নি এবং এই পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করা যার জন্য অসম্ভব ও কঠিন নয়, তার পক্ষে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করে তাঁর সামনে হাজির করে হিসেব নেয়া কঠিন বা অসম্ভব হবে কেন?

১৮. অর্থাৎ এটাই বাস্তব ও সত্য এবং গোটা মানব ইতিহাসই যখন সাক্ষ দিচ্ছে যে, জাতিসমূহের ধ্বংসের মূল কারণ হচ্ছে নবী-রসূলদের কথা না মানা আর আখেরাতকে অস্বীকার করা তখন সেই ভুল নীতি ও পথ অনুসরণ করে নিজের দুর্ভাগ্য ডেকে আনার জন্য জিদ করো না এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও কুরআনের পেশকৃত হিদায়াতের ওপর ঈমান আনো। এখানে পূর্বাপর বিষয় থেকে আপনা আপনি প্রকাশ পাচ্ছে যে, আল্লাহর নাযিলকৃত আলো অর্থ কুরআন। আলো যেমন নিজেই সমুজ্জল ও উদ্ভাসিত হয় এবং আশেপাশের অন্ধকারে ঢাকা সব জিনিসকে স্পষ্ট ও আলোকিত করে দেয় তেমনি কুরআন মজীদও এমন এক আলোকবর্তিকা যার সত্যতা আপনা থেকেই স্পষ্ট ও সমুজ্জল। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধির উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম যেসব সমস্যা বুঝার জন্য যথেষ্ট নয় কুরআনের আলোকে মানুষ সেসব সমস্যা সহজেই বুঝতে পারে। যার কাছেই এ আলোকবর্তিকা থাকবে সে চিন্তা ও কর্মের অসংখ্য আঁকাবাঁকা পথের মধ্যেও ন্যায় ও সত্যের সোজা পথ স্পষ্টভাবে দেখতে পাবে। এই সরল সোজা পথের ওপর সে সারা জীবন এমনভাবে চলতে পারবে যে, প্রতি পদক্ষেপে সে জানতে পারবে যে, গোমরাহীর দিকে নিয়ে যাওয়ার মত ছোট ছোট পায়ে চলার পথ কোন কোন দিকে যাচ্ছে, ধ্বংসের গহ্বরসমূহ কোথায় কোথায় আসছে আর এসবের মধ্যে শান্তি ও নিরাপত্তার পথই বা কোন্‌টি তাও সে জানতে পারবে।

১৯. সমবেত হওয়ার দিন অর্থ কিয়ামতের দিন। আর সবাইকে একত্র করার অর্থ সৃষ্টির শুরু থেকে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে যত মানুষ জন্ম লাভ করেছে তাদের সবাইকে একই সময়ে জীবিত করে একত্রিত করা। কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে এ বিষয়টি আরো খোলাসা করে বলা হয়েছে। যেমন ঃ সূরা হূদে বলা হয়েছে ঃ

ذٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوْعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُوْدٌ –

"সেটি এমন এক দিন যেদিনে সব মানুষকে একত্রিত করা হবে। আর সেদিন যা কিছু হবে সবার চোখের সামনে হবে।" (আয়াত ১০৩)

সূরা ওয়াকেয়ায় বলা হয়েছে

قُلْ اِنَّ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ لَمَجْمُوْعُوْنَ اِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ –

"তাদের বলো, পূর্বে অতিবাহিত এবং পরে আগমনকারী সমস্ত মানুষকে একটি নির্দিষ্ট দিনে অবশ্যই একত্রিত করা হবে।" (আয়াত ৪৯, ৫০)

২০. মূল আয়াতে يوم التغابن শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এ শব্দটির অর্থ এত ব্যাপক যে কোন ভাষারই একটি মাত্র শব্দে বা বাক্যে এর অর্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কুরআন মজীদের মধ্যেও কিয়ামতের যতগুলো নাম উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে সম্ভবত এ নামটিই সর্বাধিক অর্থপূর্ণ। তাই এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝার জন্য কিছুটা ব্যাখ্যা অপরিহার্য।

تغابن শব্দটির উৎপত্তি عبن শব্দ থেকে। এর উচ্চারণ عبن এবং غبن উভয়ই। غبن উচ্চারণটি বেশীর ভাগ কেনাবেচা এবং লেনদেনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় এবং غبن সিদ্ধান্ত ও মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন কোন সময় এর বিপরীত অর্থ বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। আরবী অভিধানে শব্দটির কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করা হয়েছে যেমন ঃ غَبِنُوا خَبِرِ النَّاقة "তাদের উট কোথায় গিয়েছে তার হদিস তাদের নেই।" غَبَنَ فُلَانًا فِى البَيعِ "ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সে অমুক ব্যক্তিকে ধোঁকা দিয়েছে।" غَبَنَ فُلَانًا "সে অমুক ব্যক্তিকে কম দিয়েছে।" غَبَنْتُ مِن حَقّى عِندَ فُلَانٍ "অমুক ব্যক্তির নিকট থেকে অধিকার আদায়ের ব্যাপারে ভুল হয়ে গিয়েছে।" غبينَ বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যার ধীশক্তির অভাব আছে এবং যার মতামত ও সিদ্ধান্ত দুর্বল। প্রতারিত ব্যক্তিকে مغبون বলা হয়। الغبن ، الغفلة ، النسيان ، فوت الحظ ، ان يبخس صاحبك فى معاملة بينك وبينه لضرب من الاخفاء –

"غبن" অর্থ "অসাবধানতা–অসতর্কতা, ভুল–ক্রটি, নিজের প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হওয়া, ব্যবসায়–বাণিজ্য ও পারস্পরিক লেনদেনের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির অপর কোন ব্যক্তির ক্ষতি করা।" ক্রয়–বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি আরেক ব্যক্তিকে ধোঁকা দিচ্ছে দেখে ইমাম হাসান বসরী (র) বললেন ঃ هذا يغبن عقلك "এ ব্যক্তি তোমাকে বোকা বানাচ্ছে।"

غبن ধাতু থেকে যখন تغابن শব্দ গঠন করা হয় তখন তাতে দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তির মধ্যে প্রতারণা বা ধোঁকাবাজি সংঘটিত হওয়ার অর্থ সৃষ্টি হয়। تَغَابَنَ القَومُ অর্থ কিছু লোক কর্তৃক কিছু লোকের সাথে ধোঁকাবাজি বা প্রতারণার আচরণ করা। অথবা এক ব্যক্তি কর্তৃক আরেক ব্যক্তির ক্ষতি করা এবং অপর ব্যক্তির তার হাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অথবা একজনের অংশ অন্যজনের পেয়ে যাওয়া এবং নিজের অংশ থেকে সেই ব্যক্তির বঞ্চিত থেকে যাওয়া অথবা ব্যবসায়ে এক পক্ষের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এবং অপর পক্ষের মুনাফা অর্জন করা অথবা কিছু লোকের অপর কিছু লোকের অসতর্ক বা দুর্বল মতামত ও সিদ্ধান্তের অধিকারী হওয়া।

এই প্রেক্ষাপটে এখন এই বিষয়টি চিন্তা করে দেখুন যে, আলোচ্য আয়াতে কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ ذلكَ يومُ التغابن "সেটি হবে تغابن –এর দিন"। এ বাক্য থেকে স্বতঃই এ অর্থ প্রকাশ পায় যে, পৃথিবীতে তো রাতদিন হরহামেশা تغابن হচ্ছেই। কিন্তু তা কেবল বাহ্যিক ও দৃষ্টি প্রলুব্ধকারী تغابن প্রকৃত ও বাস্তব تغابن নয়। প্রকৃত تغابن হবে কিয়ামতের দিন। সেখানে যাওয়ার পর জানা যাবে কে সত্যি সত্যিই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং কে লাভবান হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে কার অংশ লাভ করেছে আর কে তার নিজের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে ধোঁকায় পড়েছে আর কে অত্যন্ত সতর্ক ও বিচক্ষণ বলে প্রমাণিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কে তার জীবন রূপ পুঁজির সবটাই একটা ভুল কারবারে বিনিয়োগ করে দেউলিয়া হয়ে পড়েছে এবং কে তার সব

শক্তি, যোগ্যতা, চেষ্টা–সাধনা, অর্থ–সম্পদ আর সময়কে লাভজনক কারবারে খাটিয়ে সবটুকু মুনাফা লুটে নিয়েছে। অথচ প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি পৃথিবীর প্রকৃত অবস্থা বুঝার ব্যাপারে ধোঁকায় না পড়তো তাহলে সেও ঐ রকম মুনাফা অর্জন করতে পারতো।

মুফাস্সিরগণ يوم التغابن কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এর কয়েকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। এসব অর্থের সবগুলোই যথার্থ ও সঠিক এবং তা এর প্রকৃত অর্থের বিভিন্ন দিকের ওপর আলোকপাত করে। কোন কোন মুফাস্সির এর অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন যে, দোযখীরা জান্নাতের বাসিন্দাদের মত কাজ–কর্ম করে জান্নাতে গেলে সেখানে তারা যে অংশ লাভ করতো সেদিন তা জান্নাতবাসীগণ লাভ করবে। আর জান্নাতবাসীগণ যদি দুনিয়ায় দোযখীদের মত কাজকর্ম করে আসতেন তাহলে দোযখের যে অংশ তারা পেতেন তা সেদিন দোযখীদের অংশে পড়বে। ইমাম বুখারী (র) বুখারী শরীফে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে কিতাবুর রিকাক অধ্যায়ে যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটি এ ব্যাখ্যার সমর্থন করে। উক্ত হাদীসে নবী (সা) বলেছেন, যে ব্যক্তিই জান্নাতে যাবে তাকে সেই জায়গাটা দেখানো হবে, দুনিয়ায় খারাপ কাজকর্ম করে গেলে যা সে দোযখে পেতো। উদ্দেশ্য যাতে সে আরো বেশী 'শোকর গুজার' বা কৃতজ্ঞ হয়। আর যে ব্যক্তিই দোযখে যাবে তাকেও বেহেশতের সেই স্থানটি দেখানো হবে যা সে দুনিয়ায় ভাল কাজ করে আসলে লাভ করতো। যাতে সে আরো বেশী অনুতপ্ত হয়।

অপর কিছু সংখ্যক মুফাস্সির বলেন, সেদিন অত্যাচারিত ব্যক্তি অত্যাচারীর ততটা নেকী ছিনিয়ে নেবে যতটা তার অত্যাচারের সমান হবে। কিংবা অত্যাচারিতের ঠিক ততটা গোনাহ অত্যাচারীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হবে যা তার হক বা অধিকারের সমান হবে। কারণ কিয়ামতের দিন কারো কাছে কোন প্রকার অর্থ–সম্পদ বা সোনা–রূপা থাকবে না যা দিয়ে সে অত্যাচারিতকে ক্ষতিপূরণ দেবে বা জরিমানা আদায় করবে। মানুষের আমলসমূহই হবে সেখানে একমাত্র বিনিময়যোগ্য মুদ্রা। এ কারণে যে ব্যক্তি পৃথিবীতে কারো প্রতি জুলুম করেছে সে মজলুমের অধিকার কেবল এভাবে আদায় করতে পারবে যে, তার নিজের যতটুকু নেকী আছে তা থেকেই আর্থিক দণ্ড দেবে অথবা মজলুমের গোনাহর কিছু অংশ নিজের ওপর চাপিয়ে নিয়ে তার দণ্ড ভোগ করবে। কিছু সংখ্যক হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম থেকে এ বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে। বুখারী হাদীস গ্রন্থের কিতাবুর রিকাকে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তিই কাউকে জুলুম করে তার গোনাহর বোঝা নিজের ওপর চাপিয়ে রেখেছে তার উচিত এ পৃথিবীতে অবস্থানকালেই তা থেকে মুক্ত হয়ে যাওয়া। কারণ আখেরাতে টাকা পয়সা বা অর্থ–সম্পদের কোন কারবার থাকবে না। সেখানে তার নেকী থেকে মজলুমকে দেয়া হবে। অথবা তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নেকীও যদি না থাকে তাহলে মজলুমের কিছু গোনাহ তার ওপর অর্পণ করা হবে। অনুরূপ মসনাদে আহমাদে হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উনায়েস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী (সা) বলেছেন ঃ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন জান্নাতবাসী জান্নাতে যেতে পারবে না এবং কোন দোযখবাসী দোযখে যাবে না যতক্ষণ না সে দুনিয়ায় কারো ওপর তার কৃত জুলুমের বদলা বা ক্ষতিপূরণ দেবে। এমনকি একটি থাপ্পড়ের ক্ষতিপূরণ পর্যন্তও দিতে হবে। "আমরা বললাম, এই ক্ষতিপূরণ কিভাবে দেয়া হবে? কেননা কিয়ামতের দিন তো আমরা নিস্ব ও

নিসম্বল থাকবো।" নবী (সা) বললেন ঃ নিজের আমলের নেক কাজ ও বদ কাজ দ্বারা এই ক্ষতিপূরণ করতে হবে। মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, একবার নবী (সা) তাঁর মজলিসে লোকদের জিজ্ঞেস করলেন ঃ দরিদ্র এবং অভাবী কে তা কি তোমরা জান? লোকজন বলে উঠল, আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই দরিদ্র যার অর্থ-সম্পদ কিছুই নেই। তিনি বললেন ঃ "আমার উম্মাতের মধ্যে দরিদ্র হলো সেই ব্যক্তি যে নামায, রোযা ও যাকাত আদায় করে কিয়ামতের দিন হাজির হবে। কিন্তু এমন অবস্থায় হাজির হবে যে দুনিয়ায় কাউকে গালি দিয়েছিল, কারো প্রতি অপবাদ আরোপ করেছিল, কারো অর্থ-সম্পদ মেরে খেয়েছিল, কারো রক্তপাত ঘটিয়েছিল এবং কাউকে মারপিট করে এসেছিল। সুতরাং তার নেকীসমূহ নিয়ে ঐ সব অত্যাচারিতদের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে।" কিন্তু তাদের ক্ষতিপূরণ দেয়ার জন্য যখন তার কোন নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে না তখন তাদের কিছু কিছু গোনাহ নিয়ে তার ঘাড়ে চাপানো হবে এবং তাকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। মুসলিম ও আবু দাউদ হযরত বুরাইদা থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে আছে, নবী (সা) বলেছেন ঃ "কোন জিহাদকারীর অনুপস্থিতিতে কেউ যদি তার স্ত্রী ও পরিবারের লোকদের ব্যাপারে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভংগ করে তাহলে কিয়ামতের দিন তাকে ঐ মুজাহিদের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বলা হবে, তার ভাল কাজের যতটা ইচ্ছা তুমি নিয়ে নাও।" এরপর নবী (সা) আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ "এ ব্যাপারে তোমরা কি মনে করো? অর্থাৎ তোমরা কি মনে করো যে, এরপর সে তার জন্য কোন নেক কাজ অবশিষ্ট রাখবে?"

আরো কিছু সংখ্যক মুফাস্সির বলেছেন যে, تـغـابـن শব্দটি বেশীর ভাগ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। আর কাফের ও মু'মিনগণ তাদের দুনিয়ার জীবনে যে আচরণ ও নীতি অনুসরণ করে থাকে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে সেই আচরণকে তেজারত বা ব্যবসায়ের সাথে তুলনা করা হয়েছে। মু'মিন যদি নাফরমানির পথ পরিত্যাগ করে আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে এবং নিজের জানমাল ও চেষ্টা-সাধনা আল্লাহর পথে নিয়োজিত করে তাহলে সে যেন লোকসানজনক ব্যবসায় ছেড়ে এমন এক ব্যবসায়ে তার পুঁজি খাটাচ্ছে যা অবশেষে লাভজনক হবে এবং মুনাফা দেবে। আর একজন কাফের যখন আনুগত্যের পথ বর্জন করে নাফরমানি ও বিদ্রোহের পথে নিজের সবকিছু নিয়োজিত করে তখন সে এমন একজন ব্যবসায়ীর মত হয়ে যায়, যে হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী খরিদ করে। পরিণামে সে এর লোকসান ভোগ করবে। এই উভয় কাজের লাভক্ষতি কেবল কিয়ামতের দিনই প্রকাশ পাবে। দুনিয়ার জীবনে মু'মিন হয়তো কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকবে এবং কাফের বিপুলভাবে লাভবান হতে থাকবে। কিন্তু আখেরাতে জানা যাবে সত্যিকার অর্থে লাভজনক কারবার কে করেছে আর ক্ষতিকর কারবার কে করেছে। কুরআন মজীদে বহু সংখ্যক স্থানে এ বিষয়টি বর্ণনা করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নবর্ণিত আয়াতগুলো দেখুন, আল বাকারাহ, আয়াত ১৬, ১৭৫, ২০৭; আলে ইমরান, আয়াত ৭৭, ১৭৭; আন নিসা, ৭৪; আত তাওবা, ১১১; আন নাহল, ৯৫; ফাতের, ২৯; আস সাফ, ১০।

تـغـابـن বা হারজিতের আরো একটি অবস্থা হলো, মানুষ পৃথিবীতে কুফরী, পাপাচার এবং জুলুম ও নাফরমানির কাজে একান্ত নির্বিকারচিত্তে পরস্পরকে সহযোগিতা করে আসছে। তাদের পরস্পরের মধ্যে গভীর ভালবাসা এবং বন্ধুত্ব আছে বলেও তাদের আস্থা

রয়েছে। চরিত্রহীন পরিবারের লোকজন, গোমরাহী বিস্তারকারী নেতৃবর্গ ও তাদের অনুসারীরা, চোর ও ডাকাতদের দল, ঘুষখোর ও জালেম কর্মচারীদের গাঁটছড়া বাঁধা, বেঈমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং জমিদার গোষ্ঠী, গোমরাহী, দুষ্কর্ম ও নোংরামির প্রসারকামী দলসমূহ এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আকারে জুলুম ও বিপর্যয়ের ঝাণ্ডাবাহী সরকার ও জাতিসমূহের সবারই পারস্পরিক যোগসাজশ এই আস্থার ওপরই প্রতিষ্ঠিত। তাদের প্রত্যেকের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তিরা মনে করে তারা একে অপরের নির্ভরযোগ্য বন্ধু এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত কার্যকর সহযোগিতা বিদ্যমান। কিন্তু তারা যখন আখেরাতে পৌছবে তখন অকস্মাৎ এ বিষয়টি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, তারা সবাই মারাত্মকভাবে প্রতারিত হয়েছে। তখন প্রত্যেকেই একথা উপলব্ধি করবে যে, যাকে সে তার সর্বোত্তম বাপ, ভাই, স্ত্রী, স্বামী, ছেলে, মেয়ে, বন্ধু, নেতা, পীর, মুরীদ অথবা সহযোগী ও সাহায্যকারী মনে করে আসছিল প্রকৃতপক্ষে তারা সবাই তার জঘন্যতম শত্রু। সব রকমের আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব, সম্পর্ক ও ভালবাসা শত্রুতায় পর্যবসিত হবে। সবাই একে অপরকে গালি দিতে থাকবে, একে অপরকে লানত করতে থাকবে। আর প্রত্যেকেই তার কৃত অপরাধের বেশীর ভাগ দায়–দায়িত্ব অপরের ওপর চাপিয়ে তাকে কঠোরতর শাস্তি দিতে চাইবে। এ কথাটিও কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় বর্ণনা করা হয়েছে। নীচে উল্লেখিত আয়াতসমূহে এর কিছু উদাহরণ দেখা যেতে পারে। আল বাকারাহ, ১৬৭; আল আ'রাফ, ৩৭ থেকে ৩৯; ইবরাহীম, ২১—২২; আল মু'মিন, ১০১; আল আনকাবূত, ১২—১৩, ২৫; লোকমান, ৩৩; আল আহযাব, ৬৭—৬৮; সাবা, ৩১ থেকে ৩৩; ফাতের, ১৮; আস সাফ্‌ফাত, ২৭ থেকে ৩৩; সাদ, ৫৯ থেকে ৬১; হামীম আস সাজদা, ২৯; আয্ যুখরুফ, ৬৭; আদ দুখান, ৪১; আল মা'আরজি, ১০ থেকে ১৪; আবাসা, ৩৪ থেকে ৩৭।

২১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার অর্থ শুধু এ কথা মেনে নেয়া নয় যে, আল্লাহ আছেন। বরং তার অর্থ হলো আল্লাহ নিজে, তাঁর রসূল এবং কিতাবের মাধ্যমে যেভাবে ঈমান আনতে বলেছেন সেভাবে ঈমান আনা। এর মধ্যে রিসালাত ও কিতাবের প্রতি ঈমান আনাও আপনা থেকেই অন্তরভুক্ত। একইভাবে মানুষ যে কাজকে নেকীর কাজ মনে করে অথবা মানুষের নিজের গড়ে নেয়া নৈতিক মানদণ্ড অনুসারে যেসব কাজ করে, নেকীর কাজ বলতে সেসব কাজকেও বুঝায় না। বরং এর দ্বারা বুঝায় এমন সব কাজ–কর্ম যা আল্লাহর দেয়া আইন মোতাবেক করা হয়। তাই পরবর্তী আয়াতসমূহে যেসব শুভ ফলাফল ও পরিণামের কথা বলা হয়েছে রসূল ও কিতাবের মাধ্যম ছাড়া আল্লাহকে মানার ও নেক কাজ করার ফলাফল এবং পরিণামও তাই হবে কারো এমন ভুল ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। যে ব্যক্তিই বুঝে শুনে কুরআন অধ্যয়ন করবে তার কাছে এ বিষয়টি গোপন থাকবে না যে, কুরআনের দৃষ্টিতে এ ধরনের কোন ঈমানের নাম আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং কোন কাজের নাম নেক কাজ আদৌ নয়।

২২. কুফরী বলতে কি বুঝায়? এ কথাটিই তা স্পষ্ট করে দেয়। আল্লাহর কিতাবের আয়াতসমূহকে আল্লাহর আয়াত বলে না মানা, ঐ আয়াতসমূহে যেসব সত্য তুলে ধরা হয়েছে তা স্বীকার না করা এবং তার মধ্যে যেসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অস্বীকার ও অমান্য করাই হচ্ছে কুফরী। এরই ফলাফল ও পরিণাম পরবর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে।

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

আল্লাহর[২৩] অনুমোদন ছাড়া কখনো কোন মুসিবত আসে না[২৪]। যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করে আল্লাহ তার দিলকে হিদায়াত দান করেন।[২৫] আল্লাহ সব কিছু জানেন।[২৬] আল্লাহর আনুগত্য করো এবং রসূলের আনুগত্য করো। কিন্তু তোমরা যদি আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে সত্যকে স্পষ্টভাবে পৌছিয়ে দেয়া ছাড়া আমার রসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই।[২৭] তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। ঈমানদারদের আল্লাহর ওপরেই ভরসা করা উচিত।[২৮]

২৩. এখান থেকে ঈমানদারদের উদ্দেশ করে কথা বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে কথাগুলো পড়ার সময় একথা মনে রাখতে হবে যে, এসব আয়াত যে সময়ে নাযিল হয়েছিল তা ছিল মুসলমানদের কঠোর বিপদ ও দুঃখের সময়। তারা মক্কায় বছরের পর বছর জুলুম–অত্যাচার সহ্য করার পর নিজেদের সবকিছু ছেড়ে মদীনায় চলে এসেছিলেন। যেসব ন্যায় ও সত্যপন্থী লোক তাদেরকে মদীনায় আশ্রয় দিয়েছিলেন তাদের ওপরও দ্বিগুণ মুসিবত আপতিত হয়েছিল। একদিকে তাদেরকে আরবের বিভিন্ন অংশ থেকে তাদের কাছে চলে আসা শত শত মুহাজিরকে সহায়তা দিতে হচ্ছিল। অপরদিকে ইসলামের শত্রু সমগ্র আরবের লোকজন তাদের ওপর নিপীড়ন চালাতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল।

২৪. এ বিষয়টি সূরা আল হাদীদের ২২—২৩ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেখানে ৩৯ থেকে ৪২ নম্বর টীকায় আমরা এর ব্যাখ্যাও পেশ করেছি। যে পরিস্থিতিতে এবং যে উদ্দেশ্যে সেখানে এ কথাটি বলা হয়েছিল ঠিক অনুরূপ পরিস্থিতিতে একই উদ্দেশ্যে এখানেও তা পুনরায় বলা হয়েছে। এখানে যে সত্যটি মুসলমানদের হৃদয় মনে বদ্ধমূল করে দেয়া উদ্দেশ্য তা হচ্ছে, বিপদ–আপদ নিজেই আসে না। আর পৃথিবীতে কারো এমন শক্তিও নেই যে, সে যার ওপরে ইচ্ছা কোন বিপদ চাপিয়ে দেবে। কারো ওপর কোন বিপদ আসতে দেয়া না দেয়া সরাসরি আল্লাহর অনুমোদনের ওপর নির্ভর করে। আল্লাহর অনুমোদন সর্বাবস্থায় কোন না কোন বৃহত্তর কল্যাণ ও উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে হয় যা মানুষ জানে না বা বুঝে উঠতে পারে না।

২৫. অর্থাৎ বিপদ-আপদের ঘনঘটার মধ্যেও যে জিনিস মানুষকে সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং কঠিন থেকে কঠিনতর পরিস্থিতিতে পদস্খলন হতে দেয় না সেই একমাত্র জিনিসটি হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। যার অন্তরে আল্লাহর প্রতি ঈমান নেই সে এসব বিপদ-আপদকে হয় আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল মনে করে অথবা এসব বিপদ-আপদ দেয়ার ও দূর করার ব্যাপারে পার্থিব শক্তিসমূহকে কার্যকর বলে বিশ্বাস করে কিংবা সেসবকে এমন কাল্পনিক শক্তিসমূহের কাজ বলে মনে করে যাদেরকে মানুষের কুসংস্কারজনিত বিশ্বাস ক্ষতি ও কল্যাণ করতে সক্ষম বলে ধরে নিয়েছে অথবা তারা আল্লাহকে সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী বলে নিখাদ ও নির্ভেজাল ঈমানের সাথে মানে না। ভিন্ন ভিন্ন এসব ক্ষেত্র ও পরিস্থিতিতে মানুষ নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত সে বিপদ-আপদ বরদাশত করে বটে কিন্তু তার পরেই সে পরাজয় স্বীকার করে নেয়। তখন সেসব আস্তানায়ই মাথা নত করে, সব রকম অপমান ও লাঞ্ছনা স্বীকার করে নেয়। এ সময় সে যে কোন হীন কাজ ও আচরণ করতে পারে। সব রকম ভ্রান্ত কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। আল্লাহকে গালি দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। এমন কি আত্মহত্যা পর্যন্ত করে বসে। অপরদিকে যে ব্যক্তি একথা জানে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলার হাতেই সবকিছু। তিনিই এই বিশ্ব-জাহানের মালিক ও শাসক। তাঁর অনুমোদনক্রমেই বিপদ-মসিবত আসতে এবং দূরীভূত হতে পারে। এই ব্যক্তির মনকে আল্লাহ তা'আলা ধৈর্য ও আনুগত্য এবং তাকদীরের প্রতি সন্তুষ্ট থাকার 'তাওফীক' দান করেন। তাকে সাহস ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে সব রকম পরিস্থিতির মোকাবেলা করার শক্তি দান করেন। অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর পরিস্থিতিতেও তার সামনে আল্লাহর দয়া ও করুণা লাভের আশার আলো প্রজ্জ্বলিত থাকে। অতি বড় কোন বিপদও তাকে এতটা সাহসহারা করতে পারে না যে, সে সত্য ও সঠিক পথ থেকে সরে যাবে বা বাতিলের সামনে মাথা নত করবে কিংবা আল্লাহ ছাড়া আর কারো দরবারে তার দুঃখ-বেদনার দাওয়াই বা প্রতিকার তালাশ করবে। এভাবে প্রতিটি বিপদ মসিবতই তার জন্যে অধিক কল্যাণের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে কোন মসিবতই তার জন্য মসিবত থাকে না বরং পরিণামের দিক থেকে সরাসরি রহমতে পরিণত হয়। কেননা সে এই মসিবতে নিঃশেষ হয়ে যাক বা সফলভাবে উৎরিয়ে যাক—উভয় অবস্থায়ই সে তার প্রভুর দেয়া পরীক্ষায় সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়ে যায়। এ বিষয়টিই বুখারী ও মুসলিমের বর্ণিত একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ ، لاَيَقْضِى اللّٰهُ لَـهُ قَضَـاءً اِلاَّ كَانَ خَيْـرًا لَهُ ، اِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَاِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ الْمُؤْمِنِ -

"মু'মিনের ব্যাপারটিই বড় অদ্ভুত। আল্লাহ তার জন্য যে ফায়সালাই করুন না কেন তা সর্বাবস্থায় তার জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে। বিপদ-আপদে সে ধৈর্য অবলম্বন করে। এটা তার জন্য কল্যাণকর। সুখ-শান্তি ও সচ্ছলতা আসলে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া আর কারো ভাগ্যেই এরূপ হয় না।"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾

হে সেই সব লোক যারা ঈমান এনেছো, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাক। আর যদি তোমরা ক্ষমা ও সহনশীলতার আচরণ করো এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ অতিব ক্ষমাশীল, অতিব দয়ালু।[২৯] তোমাদের অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততি একটি পরীক্ষা। আর কেবলমাত্র আল্লাহর কাছে আছে বিরাট প্রতিদান।[৩০]

২৬. পূর্বাপর প্রসংগের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা জানেন কোন ব্যক্তি প্রকৃতই ঈমানদার এবং সে কিরূপ ঈমানের অধিকারী? তাই তিনি তার জ্ঞানের ভিত্তিতে সেই সব হৃদয়মনের অধিকারীকে হিদায়াত দান করেন যার মধ্যে ঈমান আছে এবং তার মধ্যে যে মর্যাদার ও প্রকৃতির ঈমান আছে সেই পর্যায়ের হিদায়াত তাকে দান করেন। অপর অর্থটি এও হতে পারে যে, আল্লাহ তাঁর মু'মিন বান্দার অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত নন। তিনি তাকে ঈমান গ্রহণের আহবান জানিয়ে এবং ঈমান গ্রহণের সাথে দুনিয়ার কঠিন পরীক্ষাসমূহের মধ্যে ফেলে দিয়ে তাদেরকে ঐ অবস্থায়ই পরিত্যাগ করেননি। পৃথিবীতে কোন ঈমানদারের ওপর কি মসিবত চলছে আর কোন কোন পরিস্থিতিতে সে কিভাবে তার ঈমানের দাবীসমূহ পূরণ করছে তা তিনি জানেন। তাই এ বিষয়ে আস্থা রাখো যে, আল্লাহর অনুমোদনক্রমে যে মসিবতই তোমাদের ওপর আসুক না কেন আল্লাহর কাছে তার বৃহত্তর কোন কল্যাণকর উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে এবং তার মধ্যে বৃহত্তর কোন কল্যাণ লুক্কায়িত আছে। কেননা, আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দার কল্যাণকামী। তিনি তাদেরকে বিনা কারণে বিপদে ফেলতে চান না।

২৭. এখানে এ কথার অর্থ হলো, অবস্থা ভাল বা মন্দ যাই হোক না কেন সর্বাবস্থায় আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে কিন্তু বিপদের ঘনঘটায় ঘাবড়ে গিয়ে যদি তোমরা আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে কেবল নিজেরই ক্ষতি করবে আমার রসূলের দায়িত্ব শুধু তোমাদেরকে ঠিকমত সত্য ও সঠিক পথটির সন্ধান বলে দেয়া। আর রসূল সে কাজটি ভালভাবেই করেছেন।

২৮. অর্থাৎ খোদায়ীর সর্বময় ক্ষমতা ও ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার হাতে। এই ক্ষমতা ও ইখতিয়ার অন্য কারো আদৌ নেই। তাই সে তোমাদের জন্য ভাল বা মন্দ ভাগ্য গড়তে পারে না। তিনি আনলেই কেবল সুসময় আসতে পারে এবং তিনি দূর করলেই কেবল দুঃসময় দূর হতে পারে। তাই যে ব্যক্তি আল্লাহকে মনে প্রাণে একমাত্র ইলাহ বলে স্বীকার করে সে আল্লাহর ওপর ভরসা করবে এবং একজন ঈমানদার হিসেবে

এই বিশ্বাস রেখে দুনিয়াতে তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে থাকবে যে, আল্লাহ যে পথ দেখিয়েছেন কেবল সে পথেই কল্যাণ নিহিত। এ ছাড়া তার জন্য আর কোন পথ নেই। এ পথে সফলতা লাভ হলে তা আল্লাহর সাহায্য, সহযোগিতা ও তাওফিকের মাধ্যমেই হবে ; অপর কোন শক্তির সাহায্যে তা হওয়ার নয়। আর এ পথে যদি কঠোর পরিস্থিতি, বিপদাপদ, ভয়ভীতি ও ধ্বংস আসে তাহলে তা থেকেও কেবল তিনিই রক্ষা করতে পারেন, অন্য কেউ নয়।

২৯. এ আয়াতের দু'টি অর্থ। একটি অর্থ অনুসারে আল্লাহর পথে চলতে গিয়ে বহসংখ্যক ঈমানদার পুরুষকে তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে, স্ত্রীদেরকে তাদের স্বামীদের পক্ষ থেকে এবং পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের পক্ষ থেকে যেসব কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয় সেই সব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে এ আয়াতটি প্রযোজ্য। ঈমান ও সত্য সঠিক পথে চলার ক্ষেত্রে একে অপরের পুরোপুরি বন্ধু ও সহযোগী হতে পারে একজন স্বামীর এরূপ স্ত্রী, একজন স্ত্রীর এরূপ স্বামী লাভ করা এবং আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক ও চরিত্রের দিক দিয়ে সকল সন্তান-সন্ততিই চোখ জুড়ানোর মত হওয়া পৃথিবীতে খুব কমই ঘটে থাকে। বরং সাধারণত দেখা যায় যে, স্বামী যদি নেক্কার ও ঈমানদার হয় তাহলে সে এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি লাভ করে থাকে যারা তার দীনদারী, আমানতদারী এবং সততাকে নিজেদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক বলে মনে করে। তারা চায় যে, তাদের স্বামী ও পিতা তাদের জন্য জাহান্নাম খরিদ করুক এবং হালাল ও হারামের বাছবিচার না করে যে কোন পন্থায় আরাম-আয়েশ, আমোদ-ফূর্তি এবং গোনাহ ও পাপের উপকরণ এনে দিক। কোন কোন সময় আবার এর ঠিক উল্টোটাও ঘটে থাকে। একজন নেক্কার ঈমানদার নারীকে এমন স্বামীর পাল্লায় পড়তে হয় যে স্ত্রীর শরীয়াত অনুসারে জীবন যাপন দুই চোখে দেখতে পারে না। আর সন্তানরাও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের গোমরাহী ও দুষ্কর্ম দ্বারা মায়ের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। বিশেষ করে কুফর ও ঈমানের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সময় যখন একজন মানুষের ঈমান দাবী করে যে, আল্লাহ এবং তাঁর দীনের জন্য সে ক্ষতি স্বীকার করবে, দেশ ছেড়ে হিজরাত করবে কিংবা জিহাদে অংশগ্রহণ করে নিজের জীবন পর্যন্ত বিপন্ন করবে, তখন তার পথে তার স্ত্রী ও পরিবার-পরিজনই সর্বপ্রথম বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক মুসলমানের জন্য যে বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখা দিচ্ছিল এবং কোন অমুসলিম সমাজে ইসলাম গ্রহণকারী যে কোন ব্যক্তির জন্য আজও দেখা দেয় এ আয়াতটির দ্বিতীয় অর্থটি সেই বিশেষ অবস্থা ও পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত। সেই সময় মক্কা মুয়ায্যমা ও আরবের অন্যান্য অংশে সাধারণভাবে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হতো যে, একজন লোক ঈমান এনেছে কিন্তু তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা ঈমান আনতে প্রস্তুত নয় শুধু তাই না বরং তারা তাকে ইসলাম থেকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সচেষ্ট। যেসব মেয়েরা তাদের পরিবারে একাকী ইসলাম গ্রহণ করত। তাদের জন্যও ঠিক একই পরিস্থিতির উদ্ভব হতো।

যেসব ঈমানদার নারী ও পুরুষ এ দু'টি পরিস্থিতির সম্মুখীন হতেন তাদের উদ্দেশ করে তিনটি কথা বলা হয়েছে ঃ

সর্বপ্রথম তাদের এই বলে সাবধান করা হয়েছে যে, পার্থিব সম্পর্কের দিক দিয়ে যদিও তারা মানুষের অতি প্রিয়জন কিন্তু দীন ও আদর্শের দিক দিয়ে এরা তোমাদের 'দুশমন'। তারা তোমাদের সৎকাজে বাধা দেয় এবং অসৎকাজের প্রতি আকৃষ্ট করে, কিংবা তোমাদের ঈমানের পথে বাধা সৃষ্টি করে এবং কুফরীর পথে সহযোগিতা করে কিংবা তারা কাফেরদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে মুসলমানদের সামরিক গোপন তথ্য সম্পর্কে তারা তোমাদের নিকট থেকে যাই জানতে পারে তা ইসলামের শত্রুদের কাছে পৌছিয়ে দেয়। এর যে কোন পন্থায়ই তারা দুশমনী করুক না কেন তাতে দুশমনীর ধরন ও প্রকৃতিতে অবশ্যই পার্থক্য হয়। কিন্তু সর্বাবস্থায়ই তা দুশমনী। ঈমান যদি তোমাদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকে তাহলে সেই বিচারে তাদেরকে দুশমনই মনে করতে হবে। তাদের ভালবাসায় আবদ্ধ হয়ে এ বিষয়টি কখনো ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে ঈমান ও কুফর বা আনুগত্য ও অবাধ্যতার প্রাচীর আড়াল করে আছে।

এরপর বলা হয়েছে যে, তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক। অর্থাৎ তাদের পার্থিব স্বার্থের জন্য নিজেদের পরিণাম তথা আখেরাতকে বরবাদ করো না। তোমাদের অন্তরে তাদের প্রতি ভালবাসাকে এতটা প্রবল হতে দিও না যে, তারা আল্লাহ ও রসূলের সাথে তোমাদের সম্পর্ক এবং ইসলামের প্রতি তোমাদের বিশ্বস্ত ও অনুগত থাকার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের প্রতি এতটা বিশ্বাস ও আস্থা রেখো না যাতে তোমাদের অসাবধানতার কারণে মুসলমানদের দলের গোপনীয় বিষয়সমূহ তারা অবগত হয়ে যেতে পারে এবং তা দুশমনদের হাতে পৌছে যায়। একটি হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুসলমানদেরকে এ বিষয়টি সম্পর্কেই সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে,

يُؤتَى بِرَجُلٍ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَيُقَالُ اَكَلَ عَيَالُهُ حَسَنَاتِهِ -

"কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে হাজির করা হবে। বলা হবে, তার সন্তান–সন্ততিরা তার সব নেকী ধ্বংস করে ফেলেছে।"

সর্বশেষে বলা হয়েছে যে, তোমরা যদি ক্ষমা ও সহনশীলতা দেখাও এবং ক্ষমা করে দাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। এর অর্থ হলো, তাদের শত্রুতা সম্পর্কে তোমাদেরকে অবহিত করা হচ্ছে শুধু এই জন্য যে, তোমরা সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের আদর্শকে তাদের থেকে রক্ষা করার চিন্তা–ভাবনা করবে। এই সতর্কীকরণের অর্থ কখনো এ নয় যে, যা করতে বলা হলো তার চেয়ে আরো অগ্রসর হয়ে তোমরা স্ত্রী ও সন্তানদের মারতে শুরু করবে অথবা তাদের সাথে রূঢ় আচরণ করবে অথবা সম্পর্ক এমন তিক্ত করে তুলবে যে, তোমাদের এবং তাদের পারিবারিক জীবন আযাবে পরিণত হবে। কারণ এরূপ করার দু'টি স্পষ্ট ক্ষতি আছে। একটি হলো, এভাবে স্ত্রী ও সন্তান–সন্ততির সংশোধনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার আশংকা আছে। দ্বিতীয়টি হলো, এভাবে সমাজে ইসলামের বিরুদ্ধে উল্টা খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া এভাবে আশেপাশের লোকদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের আখলাক ও চরিত্রের এমন একটি চিত্র ভেসে ওঠে যাতে তারা মনে করতে শুধু করে যে, ইসলাম গ্রহণ করার সাথে সাথে সে নিজের ঘরের ছেলেমেয়েদের জন্য পর্যন্ত কঠোর ও বদমেজাজী হয়ে যায়।

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

তাই যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় করে চলো।[৩১] শোন, আনুগত্য করো এবং নিজেদের সম্পদ ব্যয় করো। এটা তোমাদের জন্যই ভাল। যে মনের সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকলো সেই সফলতা লাভ করবে।[৩২] যদি তোমরা আল্লাহকে করযে হাসানা দাও তাহলে তিনি তোমাদেরকে তা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেবেন[৩৩] এবং তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সঠিক মূল্যায়ণকারী ও অতিব সহনশীল।[৩৪] সামনে উপস্থিত ও অনুপস্থিত সবকিছুই তিনি জানেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানী।

এ প্রসংগে এ কথাটিও মনে রাখা উচিত যে, ইসলামের প্রথম যুগে মানুষ যখন সবেমাত্র মুসলমান হতো এবং যদি তাদের পিতামাতা কাফেরই থেকে যেত তাহলে একটি সমস্যা দেখা দিত এই যে, তারা তাদের সন্তানদেরকে নতুন দীন পরিত্যাগ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করত। তাদের জন্য আরো একটি সমস্যা দেখা দিত তখন যখন তাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েরা (কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে তাদের স্বামী এবং সন্তানরা) কুফরকেই আঁকড়ে ধরে থাকত এবং সত্য দীনের পথ থেকে তাদেরকে ফিরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করত। প্রথমোক্ত পরিস্থিতির মোকাবেলার জন্য সূরা আনকাবূতের (১৮ আয়াত) এবং সূরা লোকমান (১৪ ও ১৫ আয়াত)–এ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, দীনের ব্যাপারে কখনো পিতামাতার কথা অনুসরণ করবে না। তবে পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। এখানে দ্বিতীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, নিজের দীনকে নিজের সন্তান–সন্ততির হাত থেকে রক্ষা করার চিন্তা অবশ্যই করবে কিন্তু তাই বলে তাদের সাথে কঠোর আচরণ করবে না। বরং নমনীয় আচরণ করো এবং ক্ষমা ও উদারতা দেখাও। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা আত্ তাওবা, আয়াত ২৩, ২৪; আল মুজাদালা, টীকা ৩৭; আল মুমতাহিনা, টীকা ১ থেকে ৩; আল মুনাফিকূন, টীকা ১৮)।

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল আনফাল, টীকা ২৩। এ ক্ষেত্রে তাবারানী হযরত আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সেটিও মনে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন ঃ "তুমি যে শত্রুকে হত্যা করতে পারার কারণে সফল হলে কিংবা সে তোমাকে হত্যা করলে

তুমি জান্নাত লাভ করলে সে তোমার আসল শত্রু নয়। বরং তোমার ঔরষজাত সন্তানই হয়তো তোমার আসল শত্রু। এরপর তোমার শত্রু হচ্ছে তোমার মালিকানাধীন অর্থ–সম্পদ।" তাই এখানে এবং সূরা আনফালে উভয় জায়গাতেই বলা হয়েছে যে, যদি তোমরা অর্থ–সম্পদ ও সন্তান–সন্ততির ফিতনা থেকে নিজেদের রক্ষা করতে পার এবং আল্লাহর প্রতি ভালবাসাকে তাদের প্রতি ভালবাসার ওপর প্রাধান্য দিতে সক্ষম হও তাহলে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে।

৩১. কুরআন মজীদে এক স্থানে বলা হয়েছে اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ "আল্লাহকে ভয় করার মত ভয় কর।" (আলে ইমরান, ১০২) অন্য এক স্থানে বলা হয়েছে لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا "আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যাতীত বোঝা চাপিয়ে দেন না।" (আল বাকারাহ, ২৮৬) এখানে বলা হচ্ছে, সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করতে থাকো। এ তিনটি আয়াতের বিষয়বস্তু এক সাথে মিলিয়ে চিন্তা করলে বুঝা যায়, প্রথম আয়াতে আমাদের সামনে একটি মানদণ্ড পেশ করা হয়েছে সেখানে পৌঁছার জন্য প্রত্যেক মু'মিনের চেষ্টা করা উচিত। দ্বিতীয় আয়াত আমাদেরকে এই মৌলিক নীতি অবহিত করছে যে, কোন ব্যক্তির নিকট থেকেই তার সাধ্যাতীত কোন কাজ দাবী করা হয়নি। বরং আল্লাহর দীনের অধীনে মানুষ ততটুকুই করার জন্য আদিষ্ট যা করার সামর্থ তার আছে। আর এ আয়াতটি প্রত্যেক ঈমানদারকে এ মর্মে পথনির্দেশনা দিচ্ছে যে, সে যেন সাধ্যানুসারে তাকওয়ার পথ অনুসরণে কোন ত্রুটি না করে। তার পক্ষে যতটা সম্ভব আল্লাহর হুকুম আহকাম পালন করা এবং তাঁর নাফরমানী থেকে দূরে থাকা কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে সে যদি অলসতা করে তাহলে পাকড়াও থেকে বাঁচতে পারবে না। তবে যে জিনিস তার সাধ্যের অতীত (অবশ্য কোন জিনিস তার সাধ্যের অতীত তার ফায়সালা আল্লাহই ভালভাবে করতে পারেন) সে বিষয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না।

৩২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল হাশর, টীকা ১৯।

৩৩. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল বাকারাহ, টীকা ২৬৭; আল মায়েদা, টীকা ৩৩; আল হাদীদ, টীকা ১৬।

৩৪. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফাতির, টীকা ৫২—৫৯; আশ শূরা, টীকা ৪২।